তপন সিংহের ছবি এবং বাঙালি দর্শক ও সমালোচক

রজত রায়

প্রায় অর্ধ - শতক জুড়ে তপন সিংহ সত্যিকারের একনিষ্ঠতা নিয়ে বিরামহীনভাবে ছবি তুলে চলেছেন। ১৯৫৪ থেকে ২০০৩....অঙ্কুশ থেকে শতাব্দীর কন্যা..... পঞ্চাশ বছরে আটত্রিশটি কাহিনিচিত্র। সঙ্গে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু (১৯৫৮) এবং আমার দেশ (১৯৬২) তথ্যচিত্র দুটি আর তার সঙ্গে দূরদর্শনের জন্য আদমি আউর আউরাত (১৯৮২),মানুষ (১৯৮২), ও দিদি (১৯৮৪) এই টেলিফিল্ম তিনটি এবং হুতোমের নকশা (১৯৯৭), তের পর্বের এই টিভি সিরিয়ালটিকে জুড়ে নিলে মোট সংখ্যাটা দাঁড়াবে পুরোপুরি চুয়াল্লিশে। একটানা পঞ্চাশ বছরে চুয়াল্লিশটি ছবি পরিচালনা করা কম কৃতিত্বের কথা নয়। তপন সিংহ সেই বিরল কৃতিত্ব ইতিমধ্যেই অর্জন করে ফেলেছেন। যতদূর মনে হচ্ছে বাঙালি চিত্র-পরিচালক এবং বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এটা একটা গৌরবোজ্বল রেকর্ড।

তপন সিংহের ছবি শিক্ষিত - মধ্যবিত্ত বাঙালির দ্বারা, শিক্ষিত - মধ্যবিত্ত বাঙালির জন্য, মধ্যমানের বাঙালি ছবি। সাহিত্য - রসাশ্রিত এই ছবিগুলি দীর্ঘদিন ধরে মধ্যবিত্ত বাঙালিকে বিনোদিত করেছে, তাকে আনন্দিত করেছে, তাকেকাঁদিয়েছে, আবার হাসিয়েছেও। বাঙালি দর্শক সমাজ তাঁকে গ্রহণ করেছে বলেই তিনিও দীর্ঘ পাঁচটি দশক ধরে একনাগাড়ে ছবি করে যেতে পেরেছেন এবং আজও পারছেন। মধ্যবিত্ত বাঙালির মনোজগৎ টাকে তপন সিংহ সঠিকভাবেই চিনেছিলেন এবং তিনি জানতেন কাদের জন্য তিনি ছবি করছেন। কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত বাঙালির কাছে শরৎচন্দ্র যে কারণে জনপ্রিয়, প্রায় অনুরূপ কারণেই তপন সিংহ বাঙালি চিত্রদর্শকের কাছ থেকে জনপ্রিয়তা এবং সহমর্মিতা আদায় করতে পেরেছেন।

বাঙালি গল্প শুনতে ভালবাসে, সে গল্প হবে ঘরোয়া, আবেগমথিত কারণ রসে সিক্ত, আবর কখনো হাস্যোজ্বল, কখনো ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স, আবার কখনো নিখাদ প্রেমের গল্প... তা সে মিলনান্তক অথবা বিয়োগান্তক যাই হোকনাকেন। তপন সিংহ তাই শুনিয়েছেন। আবার সমাজ - সমস্যাকে তুলে ধরে যেসব কাহিনি, সমকালের অশান্ত অস্থিরতা ও অপ্রতিরোধ্য নিম্নগামিতাকে উন্মোচিত করে, সেই সব গল্পও তাঁর ছবির গুত্বপূর্ণ বিষয়। মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় তাঁকে ব্যথিত করে, রাজনীতির দেউলিয়াপনার কথা তিনি নির্ভয়ে বলেন খুব পরিষ্কার ভাষায়,আবার কিশোরদের কল্পলোকের কাহিনিও তিনি চিত্রায়িত করেন অনায়াস দক্ষতায়। স্বদেশে নারী মুক্তির বিষয়টি তাঁকে ভাবায় এবং তারই ফলশ্রুতি তাঁর সর্বাধুনিক হিন্দি কাহিনীচিত্র ডটারস অফ দি সেঞ্চুরি... শতাব্দীর কন্যা (২০০)।

বাঙালি দর্শকের (অবশ্যই লুম্পেন বাঙালি নয়, ভদ্র শিক্ষিত বাঙালি দর্শকের) চিটা সঠিকভাবে ধরতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর চুয়াল্লিশটি ছবির মধ্যে প্রায় বত্রিশটি ছবির কাহিনিই তিনি বেছে নিয়েছিলেন বাংলাদেশের বিখ্যাত লেখকদের গল্প - উপন্যাস থেকে। অবশ্য গোটা ন'য়েক ছবির গল্প তিনি নিজেই লিখে নিয়েছেন।

যেসব বরেণ্য সাহিত্যিকদের গল্প-উপন্যাসকে ভিত্তি করে তাঁর ছবিগুলি গড়ে উঠেছে তার বিবরণটি হল এই রকমের --- রবীন্দ্রনাথ (কাবুলিওয়ালা, ক্ষুধিত পাষাণ, অতিথি এবং শতাব্দীর কন্যায় জীবিত ও মৃত), শরৎ চন্দ্র(শতাব্দীর কন্যায় অভাগীর স্বর্গ), তারাশঙ্কর (হাঁসুলি বাঁকের উপকথা), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (উপহার), বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (টনসিল), শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (ঝিন্দের বন্দী), বনফুল (আরোহী এবং হাটে বাজারে), সুবোধ ঘোষ (জতুগৃহ), প্রেমেন্দ্র মিত্র (টেলিফিল্ম দিদি), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (অঙ্কুশ), জরাসন্ধ(লৌহকপাট), রমাপদ চৌধুরি (কালামাটি, এখনই, অভিমন্যু এবং হিন্দিতে এক ডক্টর কী মৌত), সমরেশ বসু (নির্জন সৈকতে), প্রফুল্ল রায় (রাজা, টেলিফিল্ম মানুষ (বাংলা), আদমি ঔর আওরত (হিন্দি) এরং শতাব্দীর কন্যায় ছোটগল্প চাঁপিয়া), গৌরকিশোর ঘোষ (সাগিনা মাহাতো (বাংলা), সাগিনা (হিন্দি) এবং শতাব্দীর কন্যায় ছোটগল্প (চা), শংকর (এক যে ছিল দেশ), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (সবুজ দ্বীপের রাজা), শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (আজব গাঁয়ের আজব কথা), দিব্যেন্দু পালিত (অন্তর্ধান এবং শতাব্দীর ছোট্টগল্প (কাচ), ইন্দ্র মিত্র (আপনজন) এবং নাট্যকার মনোজ মিত্র (বাঞ্ছারামের বাগান)। এই তালিকা থেকেই বোঝা যায় তপন সিংহ ছবি তুলতে গিয়ে সাহিত্যের উপর কতটা নির্ভর করতেন। অবশ্য এ ছাড়াও নয়টি ছবির মূল গল্প তিনি নিজেই লিখে নিয়েছেন। সেগুলি হল .... গল্প

হলেও সত্যি, জিন্দগী-জিন্দগী(হিন্দী), হারমোনিয়ম, সফেদ হাতি (হিন্দি), আদালত ও একটি মেয়ে, বৈদূর্য রহস্য, আতঙ্ক, আজ কা রবিন হুড (হিন্দি), এবং হুইলচেয়ার। সাহিত্যের গল্পকে ভিত্তি করা অথবা নিজেই গল্প লিখে নেওয়া, এই জিনিসটাকে বিশেষভাবে কোন গুণ কিংবা দোষ বলে চিহ্নিত করা যায় না। সাহিত্যের উৎকৃষ্ট গল্প নিয়ে নিকৃষ্ট ছায়াছবি তৈরি, আবার বিপরীতে তুচ্ছ অথবা গৌণ গল্পের উপাদান নিয়ে কালজয়ী অসামান্য সিনেমা সৃষ্টি... এই দুয়েরই অজস্র উদাহরণ দেশি এবং বিদেশি চলচ্চিত্রের ইতিহাসে পাওয়া যাবে।

তপন সিংহ যে তাঁর বেশির ভাগ ছবির উপাদান বাংলা কথাসাহিত্য থেকে সংগ্রহ করেছেন তার দ্বারা বোঝা যায় শিক্ষিত বাঙালির চিকেই তিনি সব চাইতে বেশি গুত্ব দিয়েছেন, নিরক্ষর বাঙালির কাছে লিখিত কথাসাহিত্যের আলাদা কোন আবেদন নেই। কিন্তু শিক্ষিত বাঙালি উৎ কৃষ্ট গল্প-উপন্যাস - নাটকের চিত্ররূপ দেখতে অধিকতর আগ্রহ বোধ করবেন, সম্ভবত এই ঝ্বাসেই তাঁর গল্প - উপন্যাস নির্বাচন। সর্বোপরি তাঁর নিজের ভাল লাগানা লাগা, পছন্দ অপছন্দের বিষয়টা তো আছেই। ব্যক্তিগত চি এবং জীবনদর্শনের সঙ্গে না মিললেও কোন ভাল পরিচালক অন্যের লেখা গল্প থেকে ছবি করতে চাইবেন না। রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং দৃষ্টিকোণও গল্প-নির্বাচনের সময় খুবই গুত্বপূর্ণ। এই বিষয়ে তপন সিংহ নিজেই এক জায়গায় লিখেছেন ... ‘‘মানুষের একক সংগ্রামকে প্রাধান্য দিয়ে ছবি করেছি। সত্যি কথা বলতে কি, গোষ্ঠী লড়াইয়ের ওপর কোন আস্থা ছিল না আমার। আজও নেই। একক সংগ্রামের ভিত্তিতেই বেঁচে থাকে একজন মানুষ। এই আদর্শবোধের ওপরই আমার ছবি আরোহী, সাগিনা মাহাতো, হুইল চেয়ার ইত্যাদি।’’

প্রথম ছবি অঙ্কুশ -এর (১৯৫৪) কাহিনি - নির্বাচনের কাজটিই ছিল দুঃসাহসিক। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি অফ - বিট ছোটগল্প ‘সৈনিক’কে ২৯ বছরের যুবক তপন সিংহ যখন চলচ্চিত্রে রূপায়িত করবার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁকে জা নিয়েছিলেন .... ‘‘বা ! এই তো চাই। আপনাদের মতো তরতাজা তণ পরিচালকরাই তো পারবেন এসব সাহিত্যের গল্প নিয়ে ছবি করতে।’’, উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স অঞ্চলে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারের একটি প্রবীণ হাতি এই ছবির প্রধ ান চরিত্র। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র এবং উঠতি ধনতন্ত্রের যাঁতাকলে আটকে যাওয়া প্রবীণ হাতিটির ট্রাজেডি এই ছবির মুল থীম। গত ানুগতিকতার উর্ধ্বে এই বলিষ্ঠ গল্পটি বাংলা চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হচ্ছে এই সংবাদের চাইতেও বেশি আগ্রহ এবং উত্তেজনার অন্য ক ারণ ছিল বর্তমান লেখকের। ফিল্মের ভাষা- না- জানা সতের বছরের এক সাধারণ উঠতি যুবকের (স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র)কাছে প্রধাণ অ াকর্ষণ ছিল যে তার প্রিয় শিক্ষক ও লেখকের একটি ভিন্ন স্বাদের গল্পকে সম্পূর্ণ আউটডোর স্যুটিং করে ছবি তৈরি করেছেন একজন বিলেতে ট্রেনিং প্রাপ্ত নবীন পরিচালক (পথের পাঁচালি-রও দেড় বৎসর আগে)। অনেক আগ্রহ এবং প্রত্যাশার অবসান ঘটিয়ে অবশেযে অঙ্কুশ মুক্তি পেল কলকাতার তিনটি প্রেক্ষাগৃহ উত্তরা, পুরবীও উজ্জ্বলায় ১৯ মার্চ, ১৯৫৪ -এ। প্রচুর আশা আর আনন্দ নিয়ে প্রথম দিনেই প্রথম শোতে (ম্যাটিনি) ছবিটি দেখতে ঢুকলাম পূরবী প্রেক্ষাগৃহে। কিন্তু ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই মন নিরাশায় ভরে গেল। ক াক্কের কুচকুচের ভাষায় কেবলই স্বগতোক্তি করতে থাকলাম .... ‘হয়নি, হয়নি, ফেল’। তিনটি প্রায় ফাঁকা হলে দিন তিনটি করে শো, ৩ দিনে মোট ২৭টি শো করে অঙ্কুশ চিরদিনের মতো হারিয়ে গেল। বাঙালি দর্শক ছবিটিকে প্রত্যাখ্যান করলেন। অথচ ছবিটি হতে পারত ভারতবর্ষের একটি অগ্রগণ্য বিকল্প সিনেমা। তার অনেক উপাদান এবং সম্ভাবনা এতে ছিল।

প্রথম ছবির ব্যর্থতায় হতাশ না হয়ে নতুন উদ্যমে তপন সিংহ আবার ছবির কাজ শু করলেন। এবারে আর কোনরকম ঝুঁকি না নিয়ে সা হিত্যভিত্তিক জনপ্রিয় গল্প বেছে নিলেন। পরপর দু বছরে তোলা হল উপহার (১৯৫৫) এবং টনসিল (১৯৬৫)। শৈলজানন্দ এবং বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্প বাঙালি দর্শকের মোটামুটি ভাল লাগল। তপনসিংহ পায়ের নিচে কিছুটা জমি পেলেন। চতুর্থ ছবি রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প নিয়ে তোলা কাবুলিওয়ালা (১৯৫৭) একেবারে টার্গেট হিট করে বসল। তপন সিংহ রাতারাতি বাঙালি দর্শক সমাজের মন জয় করে ফেললেন। অপত্য স্নেহ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের আবেগ বিহ্বল কণরসাত্মক গল্প ছবির দর্শকের কাছে বিপুল জনপ্রিয় হল। ছবিটি যে শুধু ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করল তাই নয়, শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ছবি হিসেবে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক এবং শ্রেষ্ঠ বাংলা ছবি হিসেবে রৌপ্যপদক পেল। তপন সিংহের খ্যাতি দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। তা ছাড়া বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠআবহসঙ্গীতের জন্য রবিশংকর একটি রৌপ্য ভল্লুক পুরস্কার পেলেন।

কাবুলিওয়ালা দর্শকধন্য হলেও এবং ভারতবর্ষের অনেক শহরে প্রদর্শনের সুযোগ পেলেও ছবিটা কিন্তু টেকনিক্যালপারফেকসনের দিকে যেতে পারল না। চিত্রনাট্যের কিছুটা একপেশে এবং ঢিলেঢালা ভাব, আলোকচিত্র, শিল্প নির্দেশনা ও পরিবেশ রচনায় যথেষ্ট দুর্বলতা এবং আবেগের অতিশয্য জনিত কিছুটা কৃত্রিমতা থাকলেও ছবিটি উতরে গেল কেবলমাত্র কাহিনীর উদার মানবিক আবেদন এবং ছবি ঝ্বাসের অনন্য অভিনয়ের জোরে । তপন সিংহ নিজেই লিখেছেন....

‘‘সত্যজিৎ রায় একদিন টেলিফোন করে বললেন, ‘নিজে একজন টেকনিশিয়ান হয়ে ছবিটা টেকনিক্যালি এত খারাপ হল কী করে ? এত

ভালমানুষ হলে চলে না। কাজের সময় কোন কম্প্রোমাইজ করবেন না'।"

কাবুলিওয়ালা যখন বার্লিন ফিলা ফেস্টিভ্যালে দেখানো হচ্ছিল তখন সেখানে তপন সিংহের সঙ্গে আরও অনেকের মতো রাজ ক াপুরও ছবিটি দেখেছিলেন। তপন সিংহ লিখেছেন ..." রাজ কাপুর তো আমাকে প্রায় মারেন আর কি ! বেশ ধমকে বলেছিলেন আমায়, 'এত বাজে টেকনিক্যাল কাজ করলেন কী করে ! টেকনিক্যালি ভাল হলে আপনার কাবুলিওয়ালা গোল্ডেন বিয়ার পেয়ে যেত। ঠেকাতে পারত না কেউ।'

পরের ছবি লৌহকপাট (১৯৫৮) জরাসন্ধের লেখা জেল কয়েদিদের জীবনের এক কণ আলেখ্য। মতামত আর আবেগের কাহিনি। ক াজেই 'বাংলা সিনেমার শরৎচন্দ্র' তপন সিংহের সক্রিয়তা, এবং পরিণামে বাঙালি দর্শকের হৃদয় জয়। কোনরকম পুরস্কার না পেলেও ছবিটি দর্শকের ভালো লেগেছিল এবং কলকাতার রূপবাণী - অণা ভারতী হল তিনটিতে বেশ অনেকদিন ধরে চলেছিল। রমাপদ চৌধুরির গল্প 'বিবিকরজ' নিয়ে কালামাটি (১৯৫৮) কোলিয়ারির পটভূমিতে তোলায় কিছুটা নতুনত্বের স্বাদ নিয়ে এলো। মানবিক অ াবেদনের গল্প, অন্ধতী মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিত্বপূর্ণ অভিনয় এবং রবিশঙ্করের আবহসংগীত সব কিছু মিলিয়ে ছবিটিকে মর্যাদা এনে দিয়েছিল এবং মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালি ধীরে ধীরে স্বীকার করে নিচ্ছিলেন যে তপন সিংহ তাঁদের সপরিবারে একসঙ্গে বসে দেখার মতে া ছবি তৈরি করেন। এই বিষয়ে বীরেন্দ্রনাথ সরকারের নিউ থিয়েটার্স গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে যে চমৎ কার একটি সুস্থ ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিল তপন সিংহ যেন তারই উত্তরসাধক। কলকাতায় তিনটি হলে একটানা নয় সপ্তাহ ধরে চলে ছবিটি জনপ্রিয়তার পরীক্ষায় সস ম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছিল।

বাংলা ছবির দর্শকদের প্রসঙ্গে তপন সিংহ লিখেছেন .... আমার ছবি ওদের ভাল লাগলে আমারও ভাল লাগে, আর না লাগলে পরের ছবি নিয়ে আরও ভাবি। দর্শকরাই যে ছবির শেষ কথা।... প্রত্যেকটি ছবি করেই ভাবি, যদি দর্শককে কমিউনিকেট করতে না পারি তাহলে কেন ছবি করব? দর্শককে নিয়েই আমি সব সময়ে চলতে চাই।(৫) বাংলা প্যারালাল সিনেমার সব পরিচালকই যদি এই কথাট া একটু খেয়াল রেখে কাজ করতেন, তাহলে আখেরে লাভ হত আমাদের সবারই। ক্ষণিকের অতিথি (১৯৫৯) একটি হৃদয়স্পর্শী বিয়ে াগান্তক প্রেমের কাহিনী, সেই সঙ্গে মানবিক আবেদনেও ভরপুর। তপন সিংহ কাহিনিটি নিয়েছিলেন জনৈক নাম - না - জানা লেখক নির্মলকুমার সেনগুপ্তের কাছ থেকে। বলাই বাহুল্য, পুরোপুরি সাহিত্যধর্মী গল্প, যা বাঙালি দর্শকের হৃদয়কে নাড়া দিয়েছিল। কণ রসের প্রেমের গল্পের প্রতি বাঙালির আকর্ষণ চিরদিনের। শরৎচন্দ্রের কাশীনাথ, দেবদাস, পল্লীসমাজ বাঙালির কাছে চিরনতুন। ক্ষণিকের অতিথিও দর্শকের সেই একই অনুভূতিকে স্পর্শ করলে, তপন সিংহও সিনেমার জগতে সাফল্যলাভ করতে থাকলেন।

এরপর আবার রবীন্দ্রনাথ। ক্ষুধিত পাষাণ (১৯৬০)। রবীন্দ্রনাথের অনন্য কাব্যধর্মী ও রোমাঞ্চকর গল্পটির আবেদন সর্বজনীন এবং তপন সিংহ রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করলেন অত্যন্ত সততা ও বিস্তৃতার সঙ্গে। ছবিটি জনগণ দেখলেন এবং সহৃদয়তার সঙ্গে গ্রহণ করলেন। আলি আকবরের সঙ্গীত এরং অন্ধতী দেবী ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় ছবিটির বড় সম্পদ। দর্শক - ধন্য ছবিটি র াষ্ট্রপতির একটি রৌপ্যপদকও পেল । বিমানের শিল্পসৃষ্টি নাহলেও পরিচ্ছন্ন ভালো ছবি হিসেবে বাঙালি দর্শক এটিকে স্বীকার করে নিলেন। (অবশ্য তপনবাবু নিজেই বলেছেনসত্যজিৎ বাবুর ক্ষুধিত পাষাণ খুব একটা ভাল লাগেনি। ঝিন্দের বন্দী বেশি ভাল লেগেছিল তাঁর, কালামাটিও ভাল লেগেছিল। ঝিন্দের বন্দী (১৯৬১) শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসাধারণ জনপ্রিয় রোমান্টিক উপন্যাসের বিস্ত চিত্ররূপ। কাল্পনিক ঝিন্দ রাজ্যের বহিদৃশ্য নির্বাচন করা হয়েছিল রাজস্থানের উদয়পুরে। রহস্য ও নাটকীয়তায় ভরাএই ছবিটি অভিনয় ও সঙ্গীতে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চাররের এই গল্পটি বাঙালি দর্শকের ভালো লেগেছিল। আজ প্রায় সাড়ে চার দশক ব াদে ছবিটি যখন দূরদর্শনের ছোট পর্দায় দেখানো হয় তখনও লক্ষ্য করি সেইজনপ্রিয়তার ধারা অক্ষুণ্ণ আছে। তারপরে তারাশঙ্করের হঁ াসুলি বাঁকের উপকথা (১৯৬২) রাঢ় বাংলার বাস্তবতাকে তুলে ধরতে চেয়েছিল সেরা সাহিত্যিককে অনুসরণ করে। আন্তরিকতা এবং সততার সঙ্গে এই এপিক - ধর্মী সাহিত্য - কর্মটির চিত্ররূপ দিলেও তপন সিংহ এই ছবিটিতে তেমন দর্শকানুকূল্য পেলেন না। অথচ ছবিটি সানফ্রান্সিসকো চলচ্চিত্র উৎ সবে একটি পুরস্কার পায় এবং স্বদেশেও শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের জন্য কালী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অনুভা গুপ্ত া পুরস্কৃত হন।

নির্জন সৈকতে (১৯৬৩) সমরেশ বসুর ভ্রমণোপন্যাস আধারিত। ছবিটি জনপ্রিয় হয় এবং চারজন বিধবা নারীর ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য চারজন অভিনেত্রী...ছায়া দেবী, রেণুকা রায়, ভারতী দেবী এবং রমা গুহ ঠাকুরতা ... একই সঙ্গে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর নজির - বিহীন পুরস্কার পান। যুগপৎ জনপ্রিয়তা, প্রশংসা এবং আর্থিক সাফল্য তপন সিংহকে নতুন করে শক্তি যোগায়। তিনি লেখেন ... 'আমি কৃতজ্ঞ

সবার কাছে। এমনকী দর্শকদের কাছেও। আমারতো মনে হয়, বাঙালি দর্শকরাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠদর্শক। ... দর্শক শিক্ষিত না হলে ভাল ছবি করা অসম্ভব। ... ভাল ছবির কদর করতে গেলে দর্শককে শিক্ষিত হতেই হবে।'

১৯৬৪তে একই বছরে মাত্র ছয় মাসের ব্যবধানে তপন সিংহ বাংলা সাহিত্যের দুটি সেরা ছোটগল্পের চিত্ররূপ দিলেন... সুবোধ ঘোষের জতুগৃহ এবং বনফুলের 'অর্জুন মন্ডল' অবলম্বনে আরোহী। সুবোধ ঘোষের গল্পটি এক মধ্যবিত্ত মাঝবয়সী দম্পতির বিবাহ-বিচ্ছিন্নতার মর্মস্পর্শী কাহিনি। সংযত আবেগের হীরক দ্যুতিতে উজ্বল এই ছোটগল্পটিকে ছবির প্রয়োজনে পরিচালক অনেকখানি বাড়িয়ে নিলেন, পাশাপাশি আরও দুটি দম্পতির কাহিনিওজুড়ে দিলেন। সুবোধ ঘোষের গল্প তার তীক্ষ্নটা কিছুটা হারালেও, ছবিটি একটি পরিচ্ছন্ন আবেগধর্মী শিল্পসৃষ্টি হতে পেরেছিল। মধ্যবিত্ত পরিশীলিত দর্শক ছবিটিকে মর্যাদার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। শতদল ও মাধুরীর মতো দুটি সৎ ও হৃদয়বান মানুষের ভূমিকায় উত্তমকুমার ও অন্ধতী দেবীর অভিনয় দর্শক অনেকদিন ভুলতে পারেন নি।

আরোহী হল একজন দরিদ্র নিরক্ষর আদর্শবাদী মানুষের বড় হবার লড়াই -এর কাহিনি। ছবিটি রাষ্ট্রপতির পুরস্কার এবং লোকানো (সুইজারল্যান্ড) চলচ্চিত্র উৎ সবে একটি পুরস্কার পায় উন্নত মানবিক সম্পর্ক সৃষ্টিতে সহায়তা করার জন্য। অর্জুন মন্ডল নামে এই নিষ্ঠাবান চরিত্রটির প্রতি দর্শকের শ্রদ্ধা জাগিয়ে তুলতে পরিচালক সফল হন এবং বাঙালি দর্শক প্রসন্ন মনে তপন সিংহের ছবিকে গ্রহণ করে নেয়।

পরের ছবি রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প অতিথি (১৯৬৫)। এক পলাতক বালককে নিয়ে গীতিকবিতার মতো এই অসাধরণ গল্পটি যথেষ্ট শ্রদ্ধা আর মমতা নিয়ে ছবিতে রূপ দিলেন তপন বাবু। গল্পতে সামান্য কিছু যোগ-বিয়োগও করা হয়েছিল। নতুন অভিনেতা পার্থ মুখোপাধ্যায়কে নেওয়া হয়েছিল প্রধান চরিত্র কিশোর বালক তারাপদর ভূমিকায়।প্রধানত বহির্দৃশ্যে তোলা এই ছবিটির ভিস্যুয়াল সৌন্দর্যও অসাধারণ। ছবিটি জনপ্রিয় হল এবং স্বদেশে ও বিদেশে পুরস্কৃত হল। এই প্রসঙ্গে তপন সিংহ তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছেন ..."খবর পেলাম 'অতিথি' ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে যাচ্ছে। আবার সত্যজিৎ বাবুর টেলিফোন, 'শুনুন, রাশি রাশি নৌকোর মধ্যে তারাপদ ঝাঁপিয়ে পড়ল...এখানেই ভেনিসের জন্য ছবি শেষ কন। পরে ওসব মা-ফা বাদ দিন। আর ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকে রবীন্দ্রনাথের গান বাজাবার কি দরকার ছিল! ওটা কলকাতার জন্যে ঠিক আছে, বিদেশে কেউ বুঝবে না। মিউজিক নিজে কম্পোজ করলেন না কেন?' সত্যজিতের কথা মতো ভেনিসের জন্য ওই জায়গাতেই ছবি শেষ করি। তাতে ফল ভালই হয়েছিল।"
স্বরচিত গল্প নিয়ে তোলা মজাদার ফ্যান্টাসি গল্প হলেও সত্যি (১৯৬৬) এক সমাজমনস্ক শিল্পীর রূপকধর্মী ইচ্ছাপূরণের কাহিনি, জনগণকে যা প্রচুর পরিমাণে নির্মল আনন্দ দিতে পেরেছিল। বাঙালির ঐতিহ্যপূর্ণ যৌথ পরিবারকেকিছুটা কৌতুকের সঙ্গে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তপনবাবু বীরভূমের নিজের শৈশব, কৈশোর এবং প্রথম যৌবনের স্মৃতিকে কাজে লাগিয়েছেন। মূলত অভিনেতা রবি ঘোষ একাই ছবিটি জমিয়ে দিয়েছিলেন। দুই বৃদ্ধের ভূমিকায় যোগেশ চট্টোপাধ্যায় এবং প্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে অভিনয় করেছিলেন তা আজও ভুলতে পারিনি। তপন বাবু চেষ্টা করেছিলেন চার্লি চ্যাপলিনের মেজাজে ছবিটি তুলতে, সে পথে আংশিক সাফল্যও তিনি পেয়েছেন। মধ্যবিত্ত ছাপোষা বাঙালিকে সপরিবারে বিনোদিত করতে পারাটা নিশ্চয়ই একটা বড় কৃতিত্ব। সর্বোপরি সেই বিনোদনটি যদি পরিচ্ছন্নও চিশীল হয়। সমকালীন দর্শকের দ্বারা ছবিটি তো বিপুলভাবে গৃহীত হয়েইছিল, আজও দূরদর্শনের ছোট পর্দা মারফত সেই জনপ্রিয়তার ধারা অক্ষুণ্ণ আছে।

পরবর্তী ছবি বনফুলের উপন্যাস - ভিত্তিক হাটে বাজারে (১৯৬৭) একটি যথার্থ স্মরণীয় সৃষ্টি। অশোককুমার ও বৈজয়ন্তিমালার মতো সর্ব-ভারতীয় গ্লামারাস অভিনেতা নিলেও, তাঁদের দিয়ে পরিচালক অভিনয় করিয়েছেন একেবারে চরিত্রোপযোগী। নাটকের মানুষ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় খলনায়কের ভূমিকায়. অবিস্মরণীয় অভিনয় করেছিলেন। প্রধানত বহির্দৃশ্য তোলা এই ছবিটি জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গেই সমালোচকদের দ্বারা প্রচুর প্রশংসিত হয়। এক আত্মত্যাগী উদারহৃদয় সর্বজনপ্রিয় চিকিৎ সকের জীবনকে কেন্দ্র করে এই ছবির চিত্রনাট্য। অশোককুমার অভিনীত শ্রদ্ধেয় চরিত্রটি মুহূর্তের মধ্যে দর্শকের মন জয় করে নেয়। আবার প্রমাণিত হয় যে ভালো কাহিনিই হল ভালো ছবির প্রাণ। (অবশ্য আগেও বলেছি যে এটাই একমাত্র শর্ত নয়)। হাটে বাজারে সর্ব সর্বভারতীয় শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক পায় এবং কাম্বোডিয়ার নমপেন-এ এশিয়ান চলচ্চিত্র উৎসবে গভীর মানবিক আবেদনের জন্য একটি রৌপ্যপদক পায়।

১৯৬৭তেই পশ্চিম বাংলায় রাজনৈতিক পালাবদল এবং সামাজিক জীবনে একটা উথাল-পাথালের যুগ পড়ে। শিল্প - সংস্কৃতির জগতেও তার ঢেউআছড়ে পড়ে। নাট্যকর্মী এবং চলচ্চিত্রকারদের মধ্যেও তার প্রভাব এসে পড়ে কখনও প্রত্যক্ষ কখনও বা পরোক্ষ ভ

াবে। তপন সিংহও লিরিক্যাল জগৎ, উদার মানবিকতার জগৎ এবং নির্মল বিনোদনের জগৎ থেকে কিছুটা সরে এসে সমকালীন ব াস্তবতার রূঢ় উপাদান নিয়ে ছবি তৈরি আরম্ভ করলেন। এইপর্বের প্রথম ছবি হল ইন্দ্র মিত্রের কাহিনি অবলম্বনে আপনজন (১৯৬৮)। শহুরে মাস্তান বাহিনীর এই ছবি দেখতেদেখতে হলিউডের 'ওয়েস্ট সাইড স্টোরি' (১৯৬১) ছবিটির কথা মনে পড়ে যায়। বিশেষ করে ম াস্তান যুবকদের হাতে হাতে বোমা নিয়ে লোফালুফি করার দৃশ্যগুলি যেন নিউ ইয়র্কের ঘেটে অঞ্চলের মাস্তানদের কথা মনে করিয়ে দেয়। ছবিটি নিয়ে বেশ কিছু রাজনৈতিক বিতর্ক হয়েছিল। আমাদের বিশেষ বন্ধু, বামপন্থী চিত্র সমালোচক (রাষ্ট্রপতির পুরস্কার প্রাপ্ত)। অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় কিছুটা ক্রুদ্ধ হয়ে লিখলেন..." তপন সিংহ মধ্যবিত্তশ্রেণী-জাত এক ধরণেরতণ 'মস্তান' দলেরসমস্যা দেখাতে গিয়ে করলেন আপনজন। কিন্তু মূল কেন্দ্রীয় সমস্যা,...এক ভয়ংকর অর্থনৈতিকসমস্যা ...যা এক ধরনের 'মস্তানদের সৃষ্টি করছে...তার উল্লেখমাত্র করলেন না। নায়কের ঈদৃশ পরিবর্তনের মূল দেখালেন একটি ব্যর্থ প্রেম... একটি তণীর বঞ্চনা। তারপর মূল সমস্যার ক্ষতা কাটিয়ে ফেলবার জন্যে মাতৃস্নেহের 'সেন্টিমেন্ট' ছড়ানো হল। সব নিয়ে সৃষ্টি হল একটি বিকৃত দর্পণ... যা বাস্তবকে ভুল বোঝাতে সাহ ায্য করে।"

এই লেখার অনেক বছর বাদে তপন সিংহ 'মনে পড়ে' গ্রন্থে লিখছেন... "অনেকের ধারণা, আমার জীবন কেটেছে খুব সন্দর ও মসৃণভ াবে ... একেবারে মার্বেল পাথরে পা দিয়ে হেঁটেছি। মোটেই তা নয়। দুঃখও পেয়েছি অনেক। প্রবঞ্চিতও হয়েছি। শুনেছি নির্লজ্জ মিথ্যাচ ার। রাজনীতির শিকার হয়েছি। আমার বিদ্ধে হুইসপারিং ক্যাম্পেনও হয়েছে। আপনজন ছবিটি নাকি সি. আই. এ-র টাকায় করেছিল াম।"

নানা বাদ - প্রতিবাদ সত্ত্বেও, অন্য আরও দর্শকের সঙ্গে আমারও মনে হয়েছিল ছবিটির মূল থিম হচ্ছে 'উঠ গো ভারতলক্ষী, উঠ আদি জগতজন পূজ্যা'। তপন সিংহকে দেশদ্রোহী, সি. আই. এ. -র এজেন্ট বলে তখনও মেনে নিতেপারিনি, আজও তা মানিনা। ছবিটি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল এবহ কলকাতার মিনার, বিজলি এবং ছবিঘরে অনেকদিন ধরে চলেছিল। আপনজন ছবিটিকে নিয়ে অমিতাভ চট্টোপ াধ্যায় এরং আরও বেশ কয়েকজনের তীব্র আত্রমণের পর অনেক দিন পার হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে পৃথিবী অনেক বদলে গেছে, মানুষের ভাবনা-চিন্তা এবং আদর্শ ও নীতিবোধের জগতে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসে গেছে। কবির ভাষায় এখন---
'পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা
আর চলিবে না।'
ছবিটি তৈরি হওয়ার দীর্ঘ সাড়ে তিন দশক বাদে, আজ ২০০৪ সালে, আর একজন প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবী এবং প্রাজ্ঞ সমালোচক দীপেন্দু চত্রবর্তী ছবিটির পুনর্মূল্যায়ন করতে গিয়ে লেখেন---"উল্লেখযোগ্য যে তপন সিংহই প্রথম সমসাময়িক বেকার যুবকদের সমাজবিরোধী হয়ে ওঠার যন্ত্রণাময় বৃত্তান্ত হাজির করেন আপনজন ছবিতে (১৯৬৯), যেখানে দেখানো হয়েছে দিশেহারা এই যুবকদের লড়াইয়ের শিকার হয় তাদেরই আপনজন। এ ছবির সমার্থ যদি কিছু থাকে তবে তা এই 'পশ্চাতে রেখেছো যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে'। সমাজ যাদের ঘৃণাভরে দূরে ঠেলে দেয় তারা আজ সেই সমাজকেই আঘাত করছে, এবং এটাই ছিল অবশ্যম্ভাবী। বলা হয়ে থাকে যে তপন সিংহ সামাজিক সমস্যা নিয়ে কাহিনি বানাতে পারেন, কিন্তু সমস্যার গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেন না। সমস্যার গভীরে কোন্ বাঙালি পরিচালক যেতে পেরেছেন তার একটা তদন্ত হওয়া দরকার।"১০

এর পরেই আবার বিতর্কিত ছবি ... সাগিনা মাহাতো (বাংলা) (১৯৭০)। আবার অমিতাভ ছট্টোপাধ্যায়ের ক্রুদ্ধ আত্রমণ ...." এরপর তপন সিংহ আর একটি 'কীর্তি' করলেন গৌরকিশোর ঘোষের কুখ্যাত এবং অসদুদ্দেশ্য - প্রণোদিত গ্রন্থ 'সাগিনা মাহাতো' অবলম্বনে ছবি তুলতে গিয়ে। ছবিতে শ্রমিক আন্দোলনকে যেভাবে চিত্রিত করা হয়, তার সঙ্গে বাস্তবের কোনো মিল নেই। বোম্বে থেকে আমদানি করা হল 'স্টার'দের। মূল গল্প থেকে চিত্রনাট্য অনেক পালটাতে হল রাজনৈতিক চাপে পড়ে। তবুও সত্যিকারের সংগ্রামী শ্রমিক চরিত্র সৃষ্টি হল না। শ্রমিক আন্দোলনের বিকৃত চেহারা এবং সবাইকে ছেড়ে একজনকে 'হিরো' বানাবার অযৌত্তিক প্রয়াস দেখা গেলো"।

ছবিটি প্রথমে বামপন্থী দর্শকের মনে একটা ধাক্কা দিলেও তপন সিংহ কিন্তু তাঁর নিজের জীবনদর্শন থেকে কোনদিনই একচুলও বিচ্যুত হননি। তিনি নিজে সারাজীবন যা বিশ্বাস করেছেন তাঁর শিল্পকর্মেও তারই প্রতিফলন ঘটেছে । নিজের বিশ্বাসের জগতে তিনি সৎ ও নীতিনিষ্ঠ।

স্মৃতিকথায় তিনি লিখেছেন .... "মানুষের একক সংগ্রামের সার্থকতায় আমার বিশ্বাস। আমার অনেক ছবিতে সেই বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে। সত্যি বলতে, গোষ্ঠীবদ্ধ লড়াইয়ের প্রতি আমার কোনও দিনও আস্থা ছিল না ; আজও নেই। এই লড়াই হয়তো সহজে জেতা য

ায়, কিন্তু পরে মানুষে মতান্তর হয়, মতান্তর পরিণত হয় কলহে। ফলে লড়াইয়ের অন্তর্নিহিত আদর্শবোধও হারিয়ে যায়। দেশে কিংবা বিদেশে বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস এই সাক্ষ্য দেয়।

বাংলা সাগিনা মাহাতো জনপ্রিয় হওয়ার ফলে চার বৎসর বাদে ১৯৭৪-এ পরিচালক ছবিটি হিন্দিতে পুনর্নির্মাণ করেন। সর্ব-ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে ছবিটি কতটা জনপ্রিয় হয়েছিল সে তথ্য অবশ্য আমাদের জানা নেই। আপনজন (১৯৬৮) থেকেই তপন সিংহের মননে ও শিল্পকর্মে সমকালীন সমাজ - সমস্যা এবং শিল্পী হিসেবে তাঁর নিজের দায়বদ্ধতার কথা সোচ্চার হয়ে উঠতে দেখা গেল। পরবর্তী অনেকগুলি ছবিই তার সাক্ষ্য বহন করে। সাগিনা মাহাতো, এখনই (৯১৯৭১), রাজা (১৯৭৪), আদালত ও একটি মেয়ে (১৯৮২), অভিমন্যু (১৯৮৩), আদমি ঔর আওরত (১৯৮৪), আতঙ্ক (১৯৮৬), এক ডক্টর কি মৌত (১৯৯১), অন্তর্ধান (১৯৯২), হুইলচেয়ার (১৯৯৪) এবং সর্বশেষ ডটারস্ অফ দ্য সেঞ্চুরি (শতাব্দীর কন্যা, ২০০২) সেই কথাই প্রমাণ করে।

এখনই (১৯৭১) রমাপদ চৌধুরির রবীন্দ্র - পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাসের চিত্ররূপ। সমকালীন যুবসমাজের আদর্শহীনতা ও নীতিভ্রষ্টতার ক াহিনি এতে বলা হয়েছিল অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি দর্শক ছবিটিকে ভালোভাবেই গ্রহণ করেছিলেন এবং শ্রে ষ্ঠ চিত্রনাট্যের জন্য ছবিটি রাষ্ট্রপতির পুরস্কার পায়। জিন্দেগি, জিন্দেগি (১৯৭২) বাংলা ক্ষণিকের অতিথি-র হিন্দি পুণর্নির্মাণ। হিন্দিভ াষী দর্শক এই লিরিক -ধর্মী ছবিটিকে কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন তা আমাদের জানা নেই, তবে আর একজন খ্যাতিমান বাঙালি শিল্পী , শচীনদেব বর্মণ এই ছবির সুরকার হিসেবে রাষ্ট্রপতির পুরস্কার পান।

আঁধার পেরিয়ে (১৯৭৩) এবং সাগিনা (হিন্দি / ১৯৭৪) পার করে এসে তপন সিংহ তুলবেন তাঁর সব চাইতে তীব্রকমিটেড ছবি রাজ া (১৯৭৪)। কাহিনিসূত্র প্রফুল্ল রায়ের। এই প্রফুল্ল রায়েরই আর একটি অসাধারণ ছোটগল্প নিয়ে১৯৮২ ফিল্ম মিডিয়ামেই উনি তুলেছিলেন অসম্ভব শক্তিশালী একটি টেলিফিল্ম আদমি ঔর আওরত (হিন্দি)। ঘন্টা দেড়েকের এই ছবিতে দুটি মাত্র চরিত্র, এক পুষ অ ার এক রমণী। বিহারের এক গ্রাম্য দেহাতি দুর্গম অঞ্চলে মানুষ দুটি যাত্রী। গ্রাম পাহাড় নদী নালা ঝোপঝাড় পেরিয়ে তারা শহরে যেতে চায়। পুষ এবং নারীটি কেউ কারোরপরিচয় জানে না। শহরে যাবার উদ্দেশ্যও তাদের পৃথক। মেয়েটির যত শীঘ্র সম্ভব হাসপাত ালে ভর্তি হওয়াটা খুবইজনি, আর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তার সন্তানের জন্ম হবে। আর পুষটি শহরে যাচ্ছে জীবিকার সন্ধানে। দুর্গম পথের সহযাত্রী হিসেবে পুষটি মহিলাকে খুবই সাহায্য করে, পথের শেষ পর্যায়ে গিয়ে সে অসহায় অন্ত সত্ত্বা মেয়েটিকে নিজের পিঠের সঙ্গে বেঁধে নিতে বাধ্য হয়। জীবনের জন্য, বেঁচে থাকার জন্য তাদের তীব্র লড়াই চলতে থাকে দীর্ঘ যাত্রাপথের শেষে শেষ পর্যন্ত তারা শহরের হাসপাতালে পৌঁছে যায়. রোগিণীকে হাসপাতালে ভর্তি করানোও হয়। ডাক্তার তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করেন। মেয়েটি তার নাম বলে -- একটি মুসলিম নাম। ডাক্তার পুষটিরনাম পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন -- একটি হিন্দু নাম। একটু নীরবতা। মেয়েটি বলে -- হে অ াদমি, তোমাকে সেলাম। পুষটিবলে হে আউরত, তোমার কল্যাণ হোক। মহুয়া রায়চৌধুরি এবং অমোল পালেকার অভিনীত এই ছোট ছবিটি দেখে সত্যজিত রায় মুগ্ধ হয়ে যান, তপন সিংহকে প্রচন্ড প্রশংসা করে একটি মূল্যবান চিঠি লেখেন। পরের বছরেই ছবিটির বাংল া, রূপান্তর তৈরি হয় মানুষ (১৯৮৩)।

শিল্পী হিসেবে তপন সিংহের সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক কথা পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। বাংলা ছবির গড়পড়তা দর্শক তপন সিংহকে পরিচ্ছন্ন বিনোদনের কারিগর হিসেবে মেনে নিলেও কিছু কিছু সমালোচক এরং ফিল্ম সোসাইটি মহলের লেখকদের কাছে তিনি কিন্তু প্রায় অচ্ছুতই থেকেগেছেন। বিশেষ করে আপনজন এর পর থেকে। গত তিন দশকের বিভিন্ন ফিল্ম সোসাইটির নানা পত্র-পত্রিকার প্রায় আড়াই শ কপি অনুসন্ধান করে * তপন সিংহের ছবি সমালোচনা পেলাম ম াত্র বারোটি। অধিকতর অনুসন্ধানে হয়তো আরো দুটি-একটি লেখা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাতেও পরিস্থিতির বিশেষ বদল হবে ন া। নমুনা সমীক্ষাহিসেবে এই বারোটি উদ্ধৃতির ভিত্তিতেই মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে আসা চলে। এবং সেই সিদ্ধান্ত হল ... ফিল্ম সোস াইটিগুলির দিক থেকে খুব সচেতন ভাবেই তপন সিংহকে অবহেলা ও অগ্রাহ্য করা হয়েছে। কাজটি সঠিক হয়েছে কিনা তা একমাত্র ভবিষ্যৎই বলবে।

যে বারোটি লেখার সন্ধান পেয়েছি সেগুলি থেকে সামান্য কিছুটা করে নির্বাচিত অংশ তুলে ধরছি। বারোটি সমালোচনার ভেতর নয়টি লেখাই পুরোপুরি নিন্দাত্মক, দুটি লেখায় বেশ কিছুটা নিন্দার সঙ্গে সামান্য কিছুটা প্রশংসাও করা হয়েছে, আর একটি মাত্র সমালোচন া পাচ্ছি যেটা মূলত প্রশংসাত্মক। লেখাগুলি পরপর সাজিয়ে দিচ্ছি, উৎস / সূত্রসন্ধান নিবন্ধের শেষে দেওয়া হয়েছে। .....

১. "তপন বাবুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি ক্ষণিকের অতিথি-র হিন্দি ভাষ্য জিন্দেগি, জিন্দেগি দেখে বিস্মিত হলাম।

জনপ্রিয়তা অর্জনের দুর্বার মোহ মানুষের শিল্পচিকে কিভাবে বিনষ্ট করে দেয় এ ছবি তারই নিদর্শন। বহু ব্যবহৃতফরমুলা অনুসরণ করে বক্স-অফিস হিট করা যায় ঠিকই, কিন্তু চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সেই ছবি বা তার নির্মাতার কোন স্থান থাকে না।... মূল বাংলা ছবিতে পরিচলকের যে শিল্পবোধ ও সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল, বর্তমান ছবিতে তার বিন্দুমাত্র নেই।"

২. "মহৎ বা ক্ষমতাবান শিল্পীদের সকল সৃষ্টি সফল হয় না। কিন্তু সেই অসাফল্যের কারণ যুক্তিসম্মতভাবে
নির্দেশ করা যায়... যেহেতু সফল অসফল সমস্ত সৃষ্টির মধ্যেই একটা যোগসূত্র থাকে, বিবর্তন থাকে। এবং সমস্ত সৃষ্টিরই একটি সাধারণ লক্ষণ থাকে সততা। আঁধার পেরিয়ে ছবিটির চরিত্র এমনই যে একজন সফল পরিচালকের আকস্মিক ব্যর্থতা বা ব্যতিত্রম বলা যায় না। তপন সিংহের আগেকার ছবির যতগুলি ভাল গুণ তার সবগুলিইএখানে অনুপস্থিত এবং এখানে যতগুলি বর্জনীয় গুণ তার অধিকাংশই শেষদিকের তিনটি ছবিতে ছাড়া অন্যত্র দেখাযায় না। সংক্ষেপে, আঁধার পেরিয়ে এক আত্মবিস্মৃত শিল্পীর অনভিপ্রেত ফসল।"

৩. "সহজ গল্প চটকদারি গান অস্বাভাবিক অভিনয় ভাবালুতাসর্বস্ব নাটক এসবের উপর নির্ভর করেই তপনব
াবুরা বক্স অফিস পেয়ে যান। সিনেমার ভাষায় ইমেজ কিভাবে ভাব প্রকাশ করে, চরিত্র বিশ্লেষণ ব্যাপারটা কি, গল্পের মুড কিভাবে তৈরি হয়, এসব নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ এঁদের নেই। ... তপন সিংহের ছবি বড়লোকের ছেলেরবৌভাতের মতো। দর্শক এখানে নিমন্ত্রিত অতিথি। অতিথিকে খুশি রাখার সব রকম ব্যবস্থাই এখানে আছে।"
৪. রাজা থেকে তপনবাবুর মাথায় সমাজচেতনা ঢুকেছে। আগে তিনি সরাসরি একটা দুষ্টু দুষ্টু মিষ্টি মিষ্টি গল্প বলতেন। সেটা তবু মন্দের ভালো ছিল, এখন ওই ছবির ভেতরে বক্তব্য, সমাজভাবনা, যুবমানস ....সে এক বিতিকিচ্ছিরিকান্ড।"

৫. "চলচ্চিত্রে সার্থক গল্প বলিয়ে হিসেবে তপন সিংহ দীর্ঘদিন ধরে স্বতন্ত্র মূল্য পেয়ে আসছেন। তাঁকে 'স্মিত সৌন্দর্য পিয়াসী' এই অভিধ ায় চিহ্নিত করা হয়েছিল। কেননা ছবির পর্দায় কনটেন্টের এত পরিপাটি উপস্থাপন সচরাচর দেখা যায় না। আসলে বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন ছবিতে কাহিনির আমেজকে কোথাও তিনি ক্ষুণ্ণ হতে দেননা। বহু জনপ্রিয় প্রখ্যাত সাহিত্যরচনার সঙ্গে তিনিও আধুনিক, একটা পরিচয় দেবার জন্য সমকালীন বিষয়বস্তুতে তিনি হাত দেন। আপনজন, এখনই করার পর তাই সত্তরের মধ্য পর্বে তাঁকে রাজা করতে হয়। ... রাজায় যাদের বিষয় নিয়ে তিনি ছবি করেন, তাদের কাউকেই তিনি জানেন না। যে যুবসমাজ ছবির কেন্দ্রীয় বিষয় সেই সম াজের একটা চেহারাকে তপন সিংহ পর্দায় তুলে ধরেন। আধুনিক শহরজীবনে যে গ্লানি আমাদের মধ্যে পাকা হয়ে বসেছে,যে তীব্র সমস্য া, - সংকটের চাপে আধুনিক যুব সমাজ দ্বিধাবিভক্ত তপনবাবু তার মূলে পৌঁছান না।... সমকালীন বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে ছবি করলেই হয় না, তার মূল চরিত্র, পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে প্রতিটি উত্থান - পতন, প্রতিটি দ্বন্দ্ব - সংঘাতকে আন্তরিকভাবে চিনে নিতে হয়। তার জন্যে দৃষ্টি চাই, সহানুভূতি ও গভীর শিল্পবোধ চাই। তপনবাবুর মধ্যে যার একান্ত অভাব।"

৬. "চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটি প্রযোজিত শিশুবর্ষে মুক্তিপ্রাপ্ত একটি ছবি (সবুজ দ্বীপের রাজা) কী সাংঘাতিক অবিজ্ঞানের বিষ ছড়াতে পারে! ছোটদের জন্য ছবি যে দেশে প্রায় হয় না সে দেশের তৃষার্ত কিশোরদের সামনে এ ধরনের পানীয় পরিবেশন নি সন্দেহে অপরাধ। ... বাস্তব সত্যের সাথে কাল্পনিক সত্যের মিশ্রণ ঘটিয়ে চিত্রনির্মাতা তপন সিংহ ছোটদের প্রতি করে বসলেন এক মারাত্মক অন্যায়।"

৭. "মধ্যসফল নাটকের চিত্রায়ণ এই প্রথম নয়। তবে গ্রুপ থিয়েটারের করতালিধন্য ও অফিস ক্লাবের হটকেক নিয়ে ছবি করার ব্যাপ ারে তপন সিংহ স্মরণীয় হয়ে থাকবেন ; অন্তত নি শেষিত বুদ্ধিমত্তার একটি অপকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে বাঞ্ছারামের বাগান দৃষ্টান্ত হয়ে থ াকবে। ... বাংলা ছবির অকালের যুগে তপনবাবুরা তবু সম্মান-টম্মান পান। কিন্তু সময়ের ঘোর কেটে গেল এঁরাও বিস্মৃত হবেন। কেননা বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা .... সব থাকা সত্ত্বেও এঁরা কিছু দিলেন না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাণিজ্যের মনোভাবটি নির্মোক ছেড়ে যখন বেরিয়ে পড়ে তখন মনে হয় এত আয়োজন, ঘোষণা ও ভড়ং সব ভুয়া ফক্কিকার।"

৮. "আদালত ও একটি মেয়ে দেখেও আমার মনে হয়েছে আদালতের দৃশ্য সহ কাহিনীর নাটকীয় উপাদানই পরিচালককে ছবিটি করতে উৎসাহী করেছে। আর যে সমস্যা নিয়ে ছবি করার দাবি তিনি করেছেন সেই সমস্যাকে এনেও তিনি তার গভীরে ঢোকার চেষ্টা করেন নি, বরং বলা যায় সমস্যা নিয়ে নাটক করেছেন যা ছবিটিকে বক্স অফিস সফলতা এনে দিয়েছে।... ছবি মতই এগিয়েছে কাহিনির অসঙ্গতি, চিত্রনাট্যের দুর্বলতা এবং পলিচালনার ত্রুটিপ্রকটহয়ে উঠেছে। আমরা বিস্মিত হই তপন সিংহের মতো পাকা পরিচালকের হ াতে এইরকম কাঁচা কাজ দেখে।...
বাস্তবকে দেখাতে গিয়ে তিনি তা করে ফেললেন বিকৃত, সমাজের কোনও অংশকে দেখাতে গিয়ে তাদের প্রতিনিধিত্বমূলক অংশের বদলে

ক্ষুদ্রাংশকে দেখালেন।"

৯. "Tapan Sinha has at last come out with what is described in some papers as a 'bold theme' having some 'social relevance'. The theme of Adalat O Ekti Meye really had the Promise of unveiling the system which broods crime-prone youths and an escapist generation of young and old alike. But instead of becoming a serious social critique it degenerates into an apology for the status quo. … One must admit in the end that adalat is not one of those rut-of-the-mill Bengali films whose only distinction is incompetence. It is, on the other hand, marked by a fairly high of technical and professional competence. As a director Tapan Sinha's expertise is beyond question but not his depth and intention."

১০. "Standards for making films for TV are yet to sink in among our film – makers. Tapan Sinha has nearly mussed it in Admi aur Aurut by trying to a short film, when his forte lies in stretching a short story into a ling film. The plot is too linear and single episode, and its happy – ending has taken away a possible sting – in – tall and has calmed all anger, which Ray was able to rouse so ably in Sadgati."

১১. " আতঙ্ক ছবি বাস্তব কোনো ঘটনার ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ হয়ে ওঠে না। আইন শৃঙ্খলার অবনতি কিংবা রাজনৈতিক নেতা ও দলের মাস্তানিতে প্রশ্রয়ের মতো যে বিষয়গুলো কাহিনিকার পরিচালক ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন সেগুলো করতে গিয়ে তিনি ঘটনার গভীরে প্রবেশ করেননি, সম্ভবত করতে চাননি --- আর সত্যিই কি আমরা এমনই আইন শৃঙ্খলাহীন রাজত্বে বর্তমানে বসবাস করি?"

১২. "তপন সিংহের এক ডক্টর কী মৌত (১৯৯১) ছবিটি দেখে কষ্ট পেয়েছি। কষ্ট এক চিকিৎসক-গবেষকের জীবনের ট্র্যাজেডির জন্য ততটা নয়, যতটা আমাদের সমাজে মানুষের সামগ্রিক মূল্যবোধের অবনমনের জন্য। যাঁরা প্রশাসনের শীর্ষে রয়েছেন, যাঁরা চিকিৎসা-ব্যবস্থার শীর্ষে রয়েছেন, তাঁদের পরশ্রীকাতরতা, নীচতা, স্বার্থপরতা, অর্থগৃধ্নু মানসিকতা আমাদের সমাজের যে পচনের ছবি তুলে ধরে তা যে কোনও বিবেকসম্পন্ন মানুষকে বেদনার্ত করেতুলতে যথেষ্ট। অবশ্য এই নীচতা আজ সমাজের বিশেষ একটি শ্রেণির মধ্যেই আবদ্ধ নেই, মারাত্মক দূষিত ব্যাধির মতো সমাজের সব স্তরেই এই অসুখ ছড়িয়ে পড়েছে। তপন সিংহ এক আবিষ্কারকের কাহিনি বলেন আর তা বলতেগিয়েই ব্যক্তি-মানুষের অধ পতনের যে ছবিটি আসে তা যেমন কালো তেমনই কুৎসিত। ...

ছবির সমাপ্তির অংশটি আমার কাছে অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ এবং তাৎপর্যপুর্ণ বলে মনে হয়েছে। শারীরিক মৃত্যুরচাইতেওআত্মিক মৃত্যু অনেক বেশি মর্মান্তিক। আবিষ্কারকের স্ত্রী একবার বলেছিলেন সবাই যদি বাইরে চলে যায় তবে দেশের কী হবে ? সেই একই মানুষ যখন তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দেশের প্রতি অনুরাগ হারিয়ে ফেলেন, আমেরিকায় পাড়ি দেবার প্রস্তাবে স্মিত সম্মতি জানান, তখন মনে হয় আমরা একজন আপনজনের মৃত্যুদৃশ্য প্রত্যক্ষ করছি। রমাপদ চৌধুরির কাহিনিতে (সত্য ঘটনা অবলম্বনে) এবং প্রকৃত জীবনেও যেখানে আত্মহত্যাই ছিল গবেষকের শেষ পরিণতি, ছবিতে সেখানে দেখানো হয় একটি বিদেশি ফাউন্ডেশনের আহ্বানে গবেষণার চাকরি নিয়ে প্রোটাগনিস্টের আমেরিকা যাত্রা। এটাই আজকের দিনের (বিশেষ করে গত তিনদশকের স্বাধীন ভারতবর্ষের) বাস্তব পরিস্থিতি। স্বদেশ ও স্বভূমি ছেড়ে বহির্দেশে আমাদের প্রতিভার এই নিষ্মণ তো এক ধরনের মৃত্যুই। সাধারণ মৃত্যুর চাইতে এই বিতাড়ণ আরো বেশি মমান্তিক, আরো বেশি নির্মম।...

তপনবাবুকে ধন্যবাদ তিনি আমাদের মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের প্রশ্নটি তুলে ধরেছেন বলে। সুবিধাভোগী মধ্যশ্রেণীর নোংরা কুৎসিত চেহারাটা শিল্পের দর্পণে যিনি তুলে ধরেন তাঁর সমাজ - সচেতনাকে অভিনন্দন জানাই। "

সব শেষের দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি বর্তমান লেখকেরই তের বৎসর আগে লিখিত একটি সমালোচনা থেকে গৃহীত।প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল ..."দূষিত প্রশাসন, নষ্ট মানুষ এবং পরিত্রাতা পশ্চিম"। এক যুগেরও আগে তপন সিংহের এক ডক্টর কী মৌত ছবিটি সম্বন্ধেযে মতামত প্রকাশ করেছিলাম আজও তা অপরিবর্তিত আছে। বরং পূর্বের দৃঢ়তর ভিত্তি পেয়েছে। এক যুগ পরে আজ প্রশাসন আরও বেশি দূষিত হয়েছে। মানুষ অধিকতর মাত্রায় নষ্ট হয়ে গেছে এবং পরিত্রাতা হিসেবে পশ্চিমের ভূমিকা আরও অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

এর পরের ছবি দুটি, অন্তর্ধান (১৯৯২) এবং হুইলচেয়ার (১৯৯৪), ব্যক্তি-মানুষের একক সংগ্রামের কাহিনি। অন্তর্ধান -এ প্রশাসনিক ভ্রষ্টাচারের বিদ্ধে দীর্ঘ একক লড়াই চালিয়ে গেছেন এক প্রৌঢ় পিতা। বিষাক্ত এবং প্রতিকুল সামাজিক পরিবেশের মধ্য থেকে অনমনীয়

মনোভাব নিয়ে এই প্রৌঢ় সংগ্রাম করে গেছেন, কিছুতেই হার মানেননি। এই যে একক প্রতিরোধ এবং সংগ্রাম তপন সিংহের ছবির প্রোট াগনিষ্টরা চালিয়ে যান এটা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনদর্শনের সঙ্গে একেবারে মিলে যায়। তাঁর এই জীবনবোধের যথার্থতা এবং ঔচিত্য নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে, কিন্তু কোনমতেই যান্ত্রিকভাবে একে এক কথায় বাতিল করে দেওয়া যায় না। তাহলে তো গান্ধীজি, রবীন্দ্রনাথ কিংব াঅসকার ওয়াইল্ডকেও এক কথায় বাতিল করে দিতে হয়। বিষয়টি কোনভাবেই অতটা সরল এবং একমাত্রিক নয়।

হুইলচেয়ার-এও রয়েছে প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতার বিদ্ধে অপরাজেয় মানুষের দু সাহসিক সংগ্রামের কাহিনি। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও অক্ষমতার বিদ্ধে অসীম মনোবল নিয়ে লড়াই চালিয়ে বেঁচে থাকার আনন্দ খুঁজে নিয়েছেন এই ছবির দুই কেন্দ্রীয় চরিত্র। যতদুর জানি এই ছবির কাহিনিও প্রধানত সত্যিকারের বাস্তব চরিত্রকে অবলম্বন করেই গড়ে তোলা।

সমকালীন বাস্তবতার রূঢ় ও কঠোর বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি করতে গেলেই তপন সিংহ তাকে বিকৃত করে ফেলেন ফিল্ম সোসাইটিগুলির একাংশে এই সমালোচনা (নাকি উন্নাসিকতা!) আদপেই যুক্তিনিষ্ঠ নয়। বেশ কিছু জায়গায় তিনি হয়তো কিছু ভুল করে ফেলেন কিন্তু তঁ ার প্রচেষ্টা সৎ সাহস আছে, সততা আছে, কোনও ভন্ডামি বা হিপোক্রেসি নেই। আগামী দিনে তপন সিংহের ছবির সামগ্রিক পুনর্মুল্য ায়ন হওয়াটা খুব জরি প্রয়োজন। তখন নিশ্চয়ই এই সত্যটি পরবর্তী প্রজন্মের চোখে ধরা পড়বে।

গোটা বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি সমাজ নারীকে সামাজিক কোন অবস্থানে রেখেছে তারই একটি মূল্যায়নেরপ্রচেষ্টা হিন্দিতে ডটারস অফ দ্য সেনচুরি (২০০০)। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, গৌরকিশোর ঘোষ, প্রফুল্ল রায় এবং দিব্যেন্দু পালিতের মোট পাঁচটি ছোটগল্পকে অবলম্বন করে পরিচালক তাঁর বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। প্রথম দুইজনের চিরায়ত গল্প দুটি (জীবিত ও মৃত এবং অভাগীর স্বর্গ) সমস্ত বিতর্কের উর্ধে হলেও পরবর্তী তিনটি গল্পের নির্বাচন যথাযথ হয়েছে কিনা তা নিয়ে কিছুটা মতান্তর হতেই পারে।

তপন সিংহের সাহিত্যানুরাগ পুরো অর্ধ শতাব্দী জুড়ে তাঁর প্রথম ছবি থেকে শেষ ছবি পর্যন্ত আদ্যন্ত বজায় আছে, যে ঐতিহ্যটা অ াজকের বাংলা ছায়াছবির জগৎ থেকে প্রায় পুরোপুরি লুপ্ত হতে বসেছে। তার ফলে বাংলা সিনেমা কতটা সাবালক হল, অথবা নিম্নগ ামী হল সেই বিচার আগামী দিনের শিল্পের ইতিহাস করবে। আপাতত তপন সিংহ এবং আমাদের মতো সাধারণ দর্শকদের একমাত্র কর্তব্য হল কালের বিচারের প্রতীক্ষায় থাকা।